১০ ফাল্গুন, ১৩২৯

নাটক

বসন্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎসর্গ
শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম
স্নেহভাজনেষু

রাজা। কবি !
কবি। কী মহারাজ।
রাজা। আমি মন্ত্রণাসভা থেকে পালিয়ে এসেছি।
কবি। সৎকার্য করেছেন। কিন্তু মহারাজের এমন সুমতি হল কেন।
রাজা। বৎসর শেষ হয়ে এল, রাজকোষ শূন্যপ্রায়। মন্ত্রণাসভায় বসলেই সচিবরা আসেন তাঁদের নিজ বিভাগের জন্যে টাকা দাবি করতে। কাজেই পলায়ন ছাড়া গতি নেই।
কবি। এতে উপকার হবে।
রাজা। কার উপকার হবে।
কবি। রাজ্যের।
রাজা। সে কি কথা !
কবি। রাজা মাঝে-মাঝে সরে দাঁড়ালে প্রজারা রাজত্ব করবার অবকাশ পায়।
রাজা। তার অর্থ কী হল।
কবি। রাজার অর্থ যখন শূন্যে এসে ঠেকে প্রজা তখন নিজের অর্থ খুঁজে বের করে, তাতেই তার রক্ষা।
রাজা। কবি, তোমার কথাগুলো বাঁকা ঠেকছে। মন্ত্রণাসভা ছেড়ে এসেছি, আবার তোমার সঙ্গও ছাড়তে হবে নাকি।
কবি। না, তার দরকার হবে না। আপনি যখন পলাতক তখন তো আমাদেরই দলে এসে পড়েছেন।
রাজা। তোমার দলে ?
কবি। হাঁ মহারাজ, আমি জন্মপলাতক।
গান
আমরা বাস্তুছাড়ার দল,
ভবের পদ্মপত্রে জল।
আমরা করছি টলমল।
মোদের আসাযাওয়া শূন্য হাওয়া
নাইকো ফলাফল।
রাজা। তুমি আমাকে দলে টানতে চাও ? অতদূর এগোতে পারব না। আমাকে মন্ত্রীরা মিলে সভাছাড়া করেছে, তাই বলে কি কবির দলে ভিড়ে শেষে--
কবি। শুধু আমাকে দেখে ভয় পাবেন না, এ দলে আপনি রাজসঙ্গীও পাবেন।
রাজা। রাজসঙ্গী ? কে বলো তো।
কবি। ঋতুরাজ।
রাজা। ঋতুরাজ ? বসন্ত ?
কবি। হাঁ মহারাজ। তিনি চিরপলাতক। আমারই মতো। পৃথ্বী তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে পৃথ্বীপতি করতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি--
রাজা। বুঝেছি, বোধ করি রাজকোষের অবস্থা দেখে পালাতে ইচ্ছে করছেন।
কবি। পৃথিবীর রাজকোষ পূর্ণ করে দিয়ে তিনি পালান।
রাজা। কী দুঃখে।
কবি। দুঃখে নয়, আনন্দে।
রাজা। কবি, তোমার হেঁয়ালি রাখো ; আমার অধ্যাপকের দল তোমার হেঁয়ালি শুনে রাগ করে, বলে ওগুলোর কোনো অর্থ নেই। আজ বসন্ত-উৎসবে কী পালা তৈরি করেছ সেইটে বলো।

কবি। আজ সেই পলাতকার পালা।
রাজা। বেশ বেশ। বুঝতে পারব তো ?
কবি। বোঝাবার চেষ্টা করি নি।
রাজা। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু না-বোঝাবার চেষ্টা কর নি তো ?
কবি। না মহারাজ, এতে মূলেই অর্থ নেই, বোঝা না-বোঝার কোনো বালাই নেই, কেবল এতে সুর আছে।
রাজা। আচ্ছা বেশ, শুরু হোক। কিন্তু ও দিকে মন্ত্রণাসভার কাজ চলছে, আওয়াজ শুনে মন্ত্রীরা তো--
কবি। হাঁ মহারাজ, তাঁরাসুদ্ধ হয়তো পলাতকার দলে যোগ দিতে পারেন। তাতে দোষ কী হয়েছে।
ফাল্গুন-যে পড়েছে।
রাজা। সর্বনাশ ! এখানে এসে যদি আবার--
কবি। ভয় নেই। শূন্যকোষের কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবার ভারই মন্ত্রীদের বটে, কিন্তু শূন্যকোষের কথা ভুলিয়ে দেবার ভারই তো কবির উপরে।
রাজা। তা হলে ভালো কথা। তা হলে আর দেরি নয়। ভোলবার অত্যন্ত দরকার হয়েছে। দলবল সব প্রস্তুত তো ? আমাদের নাট্যাচার্য দিনপতি--
কবি। ঐ তো তিনি ভারতীর কমলবনের মধুগন্ধে বিহ্বল হয়ে বসে আছেন।
রাজা। দেখে মনে হচ্ছে বটে শূন্য রাজকোষের কথায় ওঁর কিছুমাত্র খেয়াল নেই।
কবি। উনি আমাদের উৎসবের বন্ধু, দুর্ভিক্ষের দিনে ওঁকে না হলে চলে না। কারণ উনি ক্ষুধার কথা সুধা দিয়ে ভোলান।
রাজা। সাধু ! আমার মন্ত্রীদের সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। বিশেষত আমার অর্থসচিবের সঙ্গে। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে আছেন। তাঁর মনে যদি পুলক-সঞ্চার করতে পারেন তা হলে--
কবি। ফস্ করে বেশি আশা দিয়ে ফেলবেন না-- রাজকোষের অবস্থা যেরকম রাজা। হাঁ হাঁ, বটে বটে।-- আচ্ছা, তবে তোমার পালা আরম্ভ হবে কী দিয়ে।
কবি। ঋতুরাজ আসবেন, প্রস্তুত হবার জন্যে আকাশে একটা ডাক পড়েছে।
রাজা। বলছে কী।
কবি। বলছে, সব দিয়ে ফেলতে হবে।
রাজা। নিজেকে একেবারে শূন্য করে ? সর্বনাশ !
কবি। না, নিজেকে পূর্ণ করে। নইলে দেওয়া তো ফাঁকি দেওয়া।
রাজা। মানে কী হল।
কবি। যে-দেওয়া সত্যি, সে দেওয়াতে ভরতি করে। বসন্ত-উৎসবে দানের দ্বারাই ধরণী ধনী হয়ে উঠবে।
রাজা। তা হলে ধরণীর সঙ্গে ধরণীপতির ঐখানে অমিল দেখতে পাচ্ছি। আমি তো দান করতে গিয়ে প্রায়ই বিপদে পড়ি--
অর্থসচিবের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হতে থাকে।
কবি। যে-দান সত্য তার দ্বারা বাইরের ধন বিনাশ পায়, অন্তরের ধন বিকাশ পেতে থাকে।
রাজা। ও আবার কী। এটা উপদেশের মতো শোনাচ্ছে, কবি।
কবি। তা হলে আর দেরি নয়, গান শুরু হোক।
বসন্তের পরিচরগণ
সব দিবি কে, সব দিবি পায়,
আয় আয় আয়।
ডাক পড়েছে ওই শোনা যায়,
আয় আয় আয়।
আসবে যে সে স্বর্ণরথে,
জাগবি কারা রিক্ত পথে
পৌষরজনী তাহার আশায়।
আয় আয় আয়।
ক্ষণেক কেবল তাহার খেলা,
হায় হায় হায়।
তার পরে তার যাবার বেলা,
হায় হায় হায়।
চলে গেলে জাগবি যবে
ধনরতন বোঝা হবে,

বহন করা হবে-যে দায়।
হায় হায় হায়।
রাজা। দাবি তো কম নয়।
কবি। দাবি বড়ো হলেই দান সহজ হয় ; ছেটো হলেই কৃপণতা জাগায়।
রাজা। তা এরা সব রাজী আছে ?
কবি। ওদের মুখেই শুনে নিন।
বনভূমি
বাকি আমি রাখব না কিছুই।
তোমার চলার পথে পথে
ছেয়ে দেব ভূঁই।
ওগো মোহন, তোমার উত্তরীয়
গন্ধে আমার ভরে নিয়ো,
উজাড় করে দেব পায়ে
বকুল বেলা জুঁই।
দখিনসাগর পার হয়ে-যে
এলে পথিক তুমি।
আমার সকল দেব অতিথিরে
আমি বনভূমি।
আমার কুলায়ভরা রয়েছে গান,
সব তোমারেই করেছি দান,
দেবার কাঙাল করে আমায়
চরণ যখন ছুঁই।
আম্রকুঞ্জ
ফল ফলাবার আশা আমি মনেই রাখি নি রে।
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দক্ষিণসমীরে।
বসন্তগান পাখিরা গায়,
বাতাসে তার সুর ঝরে যায়,
মুকুল ঝরার ব্যাকুল খেলা
আমারি সেই রাগিনী রে।
জানি নে ভাই, ভাবি নে তাই কী হবে মোর দশা
যখন আমার সারা হবে সকল ঝরা খসা।
এই কথা মোর শূন্য ডালে
বাজবে সেদিন তালে তালে,
'চরম দেওয়ায় সব দিয়েছি
মধুর মধুযামিনীরে।'
রাজা। ভাবখানা বুঝেছি কবি।
কবি। কী বুঝলেন।
রাজা। 'ফল ফলাব' বলে কোমর বেঁধে বসলে ফল ফলে না। মনের আনন্দে 'ফল চাই নে' বলতে পারলে, ফল আপনি ফলে ওঠে। আম্রকুঞ্জ মুকুল ঝরাতে ভরসা পায় বলেই তার ফল ধরে।
কবি। মহারাজ, এটা যেন উপদেশের মতো শোনাচ্ছে।
রাজা। ঠিক কথা। তা হলে গান ধরো।
করবী
যদি তারে নাই চিনি গো
সে কি আমায় নেবে চিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে।
(জানি নে জানি নে)
সে কি আমার কুঁড়ির কানে

ক'বে কথা গানে গানে,
পরান তাহার নেবে কিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে ?
(জানি নে জানি নে)
সে কি আপন রঙে ফুল রাঙাবে।
সে কি মর্মে এসে ঘুম ভাঙাবে।
ঘোমটা আমার নতুন পাতার
হঠাৎ দোলা পাবে কি তার।
গোপন কথা নেবে জিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে ?
(জানি নে জানি নে)
রাজা। ও দিকে ও কিসের গোলমাল শুনতে পাই।
কবি। দখিনহাওয়া যে এল।
রাজা। তা হয়েছে কী।
কবি। বাইরের বেণুবন উতলা হয়ে উঠেছে, কিন্তু ঘরের কোণের দীপশিখাটি নববধূর মতো শঙ্কিত।
বেণুবন
দখিনহাওয়া, জাগো জাগো
জাগাও আমার সুপ্ত এ প্রাণ।
আমি বেণু, আমার শাখায়
নীরব-যে হায় কত-না গান।
(জাগো জাগো)
দীপশিখা
ধীরে ধীরে ধীরে বও
ওগো উতল হাওয়া।
নিশীথরাতের বাঁশি বাজে,
শান্ত হও গো, শান্ত হও।
বেণুবন
পথের ধারে আমার কারা
ওগো পথিক বাঁধনহারা,
নৃত্য তোমার চিত্তে আমার
মুক্তিদোলা করে যে দান।
দীপশিখা
আমি প্রদীপশিখা তোমার লাগি
ভয়ে ভয়ে একা জাগি,
মনের কথা কানে-কানে
মৃদু মৃদু কও।
বেণুবন
গানের পাখা যখন খুলি
বাধাবেদন তখন ভুলি।
দীপশিখা
তোমার দূরের গাথা বনের বাণী
ঘরের কোণে দেয়-যে আনি।
বেণুবন
যখন আমার বুকের মাঝে
তোমার পথের বাঁশি বাজে,
বন্ধভাঙার ছন্দে আমার
মৌন কাঁদন হয় অবসান।

দখিনহাওয়া, জাগো জাগো,
জাগাও আমার সুপ্ত এ প্রাণ।
দীপশিখা
আমার কিছু কথা আছে
ভোরের বেলায় তারার কাছে,
সেই কথাটি তোমার কানে
চুপি চুপি লও
ধীরে ধীরে বও
ওগো উতল হাওয়া।
ঋতুরাজের পরিচরবর্গ
সহসা ডালপালা তোর উতলা-যে !
(ও চাঁপা, ও করবী)
কারে তুই দেখতে পেলি
আকাশে-মাঝে
জানি না যে।
কোন্ সুরের মাতন হাওয়ায় এসে
বেড়ায় ভেসে,
(ও চাঁপা, ও করবী)
কার নাচনের নূপুর বাজে
জানি না যে।
তোরে ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগে।
কোন্ অজানার ধেয়ান যে তোর
মনে জাগে।
কোন্ রঙের মাতন উঠল দুলে।
ফুলে ফুলে
(ও চাঁপা, ও করবী)
কে সাজালে রঙিন সাজে
জানি না যে।
কবি। ঋতুরাজের দূতেরা ভাবছে কেউ খবর পায় নি-- পায়ের শব্দ যাচ্ছে না। কিন্তু পায়ের শব্দ যে হৃদকম্পনের মধ্যে ধরা পড়ে।
মাধবী
সে কি ভাবে গোপন রবে
লুকিয়ে হৃদয় কাড়া
তাহার আসা হাওয়ায় ঢাকা,
সে যে সৃষ্টিছাড়া।
হিয়ায় হিয়ায় জাগল বাণী,
পাতায় পাতায় কানাকানি,
‘ওই এল যে’, ‘ওই এল যে’
পরান দিল সাড়া।
এই তো আমার আপনারি এই
ফুল ফোটানোর মাঝে
তারে দেখি নয়ন ভ’রে
নানা রঙের সাজে।
এই-যে পাখির গানে গানে
চরণধ্বনি বয়ে আনে,
বিশ্ববীণার তারে তারে
এই তো দিল নাড়া।
রাজা। কবি, ঐ তো পূর্ণচন্দ্র উঠেছে দেখছি।

কবি। দখিনহাওয়ায় যেন কোন্ দেবতার স্বপ্ন ভেসে এল।
রাজা। শুধু দখিনহাওয়ায় ওকে ভাসালে চলবে না কবি, তোমার গানের সুরও চাই। জগতে কেবল যে দেবতাই আছেন তা তো নয়।
শালবীথিকা
ভাঙল হাসির বাঁধ।
অধীর হয়ে মাতল কেন
পূর্ণিমার ওই চাঁদ।
উতল হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে
মুকুলছাওয়া বকুলবনে
দোল দিয়ে যায়, পাতায় পাতায়
ঘটায় পরমাদ।
ঘুমের আঁচল আকুল হল
কী উল্লাসের ভরে।
স্বপন যত ছড়িয়ে প'ল
দিকে দিগন্তরে।
আজ রাতের এই পাগলামিরে
বাঁধবে ব'লে কে ওই ফিরে,
শালবীথিকায় ছায়া গেঁথে
তাই পেতেছে ফাঁদ।
বকুল
ও আমার চাঁদের আলো,
আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছ যে আমার
পাতায় পাতায় ডালে ডালে।
যে-গান তোমার সুরের ধারায়
বন্যা জাগায় তারায় তারায়,
মোর আঙিনায় বাজল সে-সুর
আমার প্রাণের তালে তালে।
সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে
তোমার হাসির ইশারাতে।
দখিনহাওয়া দিশাহারা
আমার ফুলের গন্ধে মাতে।
শুভ্র, তুমি করলে বিলোল
আমার প্রাণে রঙের হিলোল,
মর্মরিত মর্ম আমার
জড়ায় তোমার হাসির জালে।
রাজা। সব তো বুঝলুম। আকাশ থেকে চাঁদ দেখছি পৃথিবীর হৃদয়কে দোলা লাগিয়েছে। কিন্তু ওঁকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনে কষে দোলা না দিতে পারলে তো জবাব দেওয়া হয় না তার কী করলে।
কবি। তার তো ব্যবস্থা হয়েছে মহারাজ। আমাদের নদীর ঢেউ আছে তো, সে দিকে চেয়ে দেখো না। চাঁদ টলোমলো।
নদী
কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা।
আপন আলোর স্বপন-মাঝে বিভল ভোলা।
কেবল তোমার চোখের চাওয়ায়
দোলা দিলে হাওয়ায় হাওয়ায়,
বনে বনে দোল জাগালো
ওই চাহনি তুফানতোলা।
আজ মানসের সরোবরে

কোন্ মাধুরীর কমলকানন
দোলাও তুমি ঢেউয়ের 'পরে।
তোমার হাসির আভাস লেগে
বিশ্বদোলন দোলার বেগে
উঠল জেগে আমার গানের
কল্লোলিনী কলরোলা।
রাজা। এবার ঐ কে আসে।
কবি। বলব না। চিনতে পারেন কি না দেখতে চাই।
দখিনহাওয়া
শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে
উদাস-করা কোন্ সুরে।
ঘরছাড়া ওই কে বৈরাগী
জানি না যে কাহার লাগি
ক্ষণে ক্ষণে শূন্য বনে যায় ঘুরে।
চিনি চিনি হেন ওরে হয় মনে,
ফিরে ফিরে যেন দেখা ওর সনে।
ছদ্মবেশে কেন খেল,
জীর্ণ এ বাস ফেলো ফেলো,
প্রকাশ করো চিরনূতন বন্ধুরে।
রাজা। ওহে কবি, তোমার এ পালাটা কী রকম করে তুলেছ। বরযাত্রীরই ভিড়, বর কোথায়।
তোমার ঋতুরাজ কই।
কবি। ঐ যে, এই খানিক আগে দেখলেন।
রাজা। ঐ জীর্ণ বসন প'রে শুকনো পাতা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে? ওতে তো নবীনের রূপ দেখলুম না।
ও তো মূর্তিমান পুরাতন।
কবি। তবে তো চিনতে পারেন নি, ঠকেছেন। আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার এক পিঠে নূতন, এক পিঠে পুরাতন। যখন উলটে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা, ঝরা ফুল ; আবার যখন পালটে নেন তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী-- তখন ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরি, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ নূতনপুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন।
রাজা। তা হলে নবীন মূর্তিটা একবার দেখিয়ে দাও। আর দেরি কেন।
কবি। ঐ-যে এসেছেন। পথিকবেশে, নূতনপুরাতনের মাঝখানকার নিত্য-যাতায়াতের পথে।
রাজা। তোমার পলাতকা বুঝি পথে-পথেই থাকেন?
কবি। হাঁ, উনি বাস্তুছাড়ার দলপতি, আমি ওঁরই গানের তলপি বয়ে বেড়াই।
গান
গানগুলি মোর শৈবালেরি দল--
ওরা বন্যাধারায় পথ যে হারায়
উদ্দাম চঞ্চল।
ওরা কেনই আসে যায় বা চ'লে,
অকারণের হাওয়ায় দোলে,
চিহ্ন কিছুই যায় না রেখে,
পায় না কোনো ফল।
ওদের সাধন তো নাই--
কিছু সাধন তো নাই,
ওদের বাঁধন তো নাই--
কোনো বাঁধন তো নাই।
উদাস ওরা উদাস করে
গৃহহারা পথের স্বরে,
ভুলে-যাওয়ার স্রোতের 'পরে

করে টলমল।
রাজা। আর দেরি নয়, কবি। ঐ দেখো, মন্ত্রণাসভা থেকে অর্থসচিব এসেছে। রাজকোষের কথা পাড়বার পূর্বেই ঋতুরাজের আসর জমাও।
মাধবী মালতি ইত্যাদি
তোমার বাস কোথা-যে পথিক ওগো,
দেশে কি বিদেশে।
তুমি হৃদয়-পূর্ণ-করা, ওগো
তুমিই সর্বনেশে।
ঋতুরাজ
আমার বাস কোথা-যে জান নাকি,
শুধাতে হয় সে কথা কি,
ও মাধবী, ও মালতি
মাধবী মালতী ইত্যাদি
হয়তো জানি, হয়তো জানি, হয়তো জানি নে,
মোদের বলে দেবে কে সে।
মনে করি আমার তুমি,
বুঝি নও আমার।
বলো বলো বলো পথিক,
বলো তুমি কার।
ঋতুরাজ
আমি তারি যে আমারে
যেমনি দেখে চিনতে পারে
ও মাধবী, ও মালতী।
মাধবী মালতী ইত্যাদি
হয়তো চিনি, হয়তো চিনি, হয়তো চিনি নে,
মোদের বলে দেবে কে সে।
বনপথ
আজ দখিনবাতাসে
নাম-না-জানা কোন্ বনফুল
ফুটল বনের ঘাসে।
ঋতুরাজ
ও মোর পথের সাথী, পথে পথে
গোপনে যায় আসে।
বনপথ
কৃষ্ণচূড়া চূড়ায় সাজে,
বকুল তোমার মালার মাঝে,
শিরীষ তোমার ভরবে সাজি--
ফুটেছে সেই আশে।
ঋতুরাজ
এ মোর পথের বাঁশির সুরে সুরে
লুকিয়ে কাঁদে হাসে।
বনপথ
ওরে দেখ বা নাই দেখ, ওরে
যাও বা না-যাও ভুলে।
ওরে নাই-বা দিলে দোলা, ওরে
নাই-বা নিলে তুলে।
সভায় তোমার ও কেহ নয়,

ওর সাথে নেই ঘরের প্রণয়,
যাওয়া-আসার আভাস নিয়ে
রয়েছে একপাশে।
ঋতুরাজ
ওগো ওর সাথে মোর প্রাণের কথা
নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
রাজা। খুব জমেছে, কবি। সুরের দোলায় চাঁদকে দুলিয়েছ। ঐ দেখো-না, আমার অর্থসচিব সুদ্ধ দুলছে।
কবি। এবার সময় হয়েছে।
রাজা। কিসের সময়।
কবি। ঋতুরাজের যাবার সময়।
রাজা। আমাদের অর্থসচিবকে চোখে পড়েছে নাকি।
কবি। বলেইছি তো, পূর্ণ থেকে রিক্ত, রিক্ত থেকে পূর্ণ, এরই মধ্যে ওঁর আনাগোনা। বাঁধন পরা, বাঁধন খোলা, এও যেমন এক খেলা, ওও তেমনি এক খেলা।
রাজা। আমি কিন্তু ঐ পূর্ণ হওয়ার খেলাটাই পছন্দ করি।
কবি। যথার্থ পূর্ণ হয়ে উঠলে রিক্ত হওয়ার খেলায় ভয় থাকে না।
রাজা। বোধ হচ্ছে যেন এখনই উপদেশ দিতে শুরু করবে।
কবি। আচ্ছা তা হলে আবার গান শুরু হোক।
ঋতুরাজ
এখন আমার সময় হল,
যাবার দুয়ার খোলো খোলো।
হল দেখা, হল মেলা,
আলোছায়ায় হল খেলা,
স্বপন-যে সে ভোলো ভোলো।
আকাশ ভরে দূরের গানে,
অলখ দেশে হৃদয় টানে।
ওগো সুদূর, ওগো মধুর,
পথ বলে দাও পরানবঁধূর,
সব আবরণ তোলো তোলো।
মাধবী
বিদায় যখন চাইবে তুমি দক্ষিণসমীরে,
তোমায় ডাকব না তো ফিরে।
করব তোমায় কী সম্ভাষণ।
কোথায় তোমার পাতব আসন
পাতাঝরা কুসুমঝরা নিকুঞ্জকুটিরে।
তুমি আপ নি যখন আসো তখন
আপ্ নি কর ঠাঁই,
আপ্নি কুসুম ফোটাও, মোরা
তাই দিয়ে সাজাই।
তুমি যখন যাও, চলে যাও,
সব আয়োজন হয়-যে উধাও,
গান ঘুচে যায়, রং মুছে যায়,
তাকাই অশ্রুনীরে।
ঋতুরাজ
এবেলা ডাক পড়েছে কোন্‌খানে
ফাগুনের ক্লান্ত ক্ষণের শেষ গানে।
সেখানে স্তব্ধ বীণার তারে তারে,
সুরের খেলা ডুবসাঁতারে,

সেখানে চোখ মেলে যার পাই নে দেখা
তাহারে মন জানে গো, মন জানে।
এবেলা মন যেতে চায় কোন্‌খানে
নিরালায় লুপ্ত পথের সন্ধানে।
সেখানে মিলনদিনের ভোলা হাসি
লুকিয়ে বাজায় করুণ বাঁশি,
সেখানে যে কথাটি হয় না বলা
সে কথা রয় কানে গো, রয় কানে।
ঝুমকোলতা
না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো।
মিলনপিয়াসী মোরা,
কথা রাখো, কথা রাখো।
আজও বকুল আপনহারা, হায় রে,
ফুল ফোটানো হয় নি সারা,
সাজি ভরে নি,
পথিক ওগো, থাকো থাকো।
চাঁদের চোখে জাগে নেশা,
তার আলো-- গানে গন্ধে মেশা।
দেখো চেয়ে কোন্‌ বেদনায় হায় রে,
মল্লিকা ওই যায় চলে যায়
অভিমানিনী।
পথিক, তারে ডাকো ডাকো।
আকন্দ
এবার বিদায়বেলার সুর ধরো ধরো,
(ও চাঁপা, ও করবী)
তোমার শেষ ফুলে আজ সাজি ভরো।
যাবার পথে আকাশতলে
মেঘ রাঙা হল চোখের জলে,
ঝরে পাতা ঝর ঝর।
হেরো হেরো ওই রুদ্র রবি
ভাঙায় রক্তছবি।
খেয়াতরীর রাঙা পালে
আজ লাগল হাওয়া ঝড়ের তালে,
বেণুবনের ব্যাকুল শাখা থর থর।
ধুতুরা
আজ খেলাভাঙার খেলা খেলবি আয়।
সুখের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়।
মিলনমালার আজ বাঁধন তো টুটবে,
ফাগুনদিনের আজ স্বপন তো ছুটবে,
উধাও মনের পাখা মেলবি আয়।
অস্তগিরির ওই শিখরচূড়ে
ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে।
কালবৈশাখীর হবে যে-নাচন,
সাথে নাচুক তোর মরণবাঁচন,
হাসিকাঁদন পায়ে ঠেলবি আয়।
জবা
ভয় করব না রে

বিদায়বেদনারে।
আপন সুধা দিয়ে
ভরে দেব তারে।
চোখের জলে সে-যে নবীন রবে,
ধ্যানের মণিমালায় গাঁথা হবে,
পরব বুকের হারে।
নয়ন হতে তুমি আসবে প্রাণে,
মিলবে তোমার বাণী আমার গানে।
বিরহব্যথায় বিধুর দিনে
দুখের আলোয় তোমায় নেব চিনে,
এ মোর সাধনা রে।
সকলে
ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
বিচ্ছেদে তোর খণ্ডমিলন পূর্ণ হবে।
আয় রে সবে
প্রলয়গানের মহোৎসবে।
তাণ্ডবে ওই তপ্ত হাওয়ায় ঘূর্ণি লাগায়,
মত্ত ঈশান বাজায় বিষাণ শঙ্কা জাগায়,
ঝংকারিয়া উঠল আকাশ ঝঞ্ঝারবে।
আয় রে সবে
প্রলয়গানের মহোৎসবে।
রাজা। আমার মন্ত্রণাসভার দশা করলে কী। সব মন্ত্রী-যে এখানে এসে জুটেছে। ঐ দেখো, আমার অর্থসচিবসুদ্ধ-যে নাচতে শুরু করে দিলে। বড়ো লঘু হয়ে পড়ছেন না ?
কবি। ওঁর-যে থলি শূন্য হয়ে গেছে, তাই নাচে টেনেছে। বোঝা ভারী থাকলে গৌরবে নড়তে পারতেন না। আজ আমাদের অগৌরবের উৎসব।
রাজা। রাজগৌরব ?
কবি। সেও টিঁকল না। তাই তো ঋতুরাজ আজ রাজবেশ খসিয়ে দিয়ে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে চলেছেন। এবার ধরণীতে তপস্যার দিন এসেছে, অর্থসচিবদের হাতে কাজ থাকবে না।
ভাঙনধরার ছিন্ন-করার রুদ্র নাটে
যখন সকল ছন্দ বিকল, বন্ধ কাটে,
মুক্তিপাগল বৈরাগীদের চিত্ততলে
প্রেমসাধনার হোমহুতাশন জ্বলবে তবে।
ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
সব আশাজাল যায় রে যখন উড়ে পুড়ে
আশার অতীত দাঁড়ায় তখন ভুবন জুড়ে,
স্তব্ধ বাণী নীরব সুরে কথা কবে
আয় রে সবে
প্রলয়গানের মহোৎসবে।